ব্লক- ১ একক-১

বাংলা ভাষার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

BL-1 UNIT-1

গঠন

১.১.১ উদ্দেশ্য

১.১.২ প্রস্তাবনা

১.১.৩ প্রথম ভাগ – বাংলা ভাষার জন্ম ও শ্রেণী বিভাগ

১.১.৪ সারাংশ

১.১.৫ দ্বিতীয় ভাগ – প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

১.১.৬ সারাংশ

১.১.৭ তৃতীয় ভাগ – মধ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

১.১.৮ সারাংশ

১.১.৯ চতুর্থ ভাগ – আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও উপভাষা

১.১.১০ সারাংশ

১.১.১১ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

১.১.১২ উত্তর সংকেত

১.১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি ভারতবর্ষে ভাষার বিস্তার ও তার সম্প্রসারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা গোষ্ঠীতে বাংলা ভাষার স্থান ও তার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। বাংলা ভাষার ক্রমিক ভাষাতাত্ত্বিক রূপ পরিবর্তন ও তার সম্পূর্ণ গঠনের দিকটি সম্পর্কেও এখানে বলা হয়েছে।

১.১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষার বিবর্তনের স্তরপর্যায় ও বৈশিষ্ট্য

এই এককে প্রথমেই বলে নেওয়া হবে ইন্দো ইউরোপীয় আর্য ভাষা থেকে বিবর্তনের সূত্র মেনে ইন্দো ইরানীয় আর্য ভাষা থেকে ভারতীয় আর্য ভাষা হয়ে ক্রমশ বাংলা ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা হিসাবে কিভাবে রূপ পরিগ্রহণ করল। এর পরে সেই নতুন জন্ম নেওয়া বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের, মধ্য যুগের ও আধুনিক যুগের ধ্বনিগত ও রূপগত বদলের চিত্রটিকে নির্দিষ্ট ক্রমে তুলে ধরা হবে। বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে পদার্পণ করার পর তার উপভাষার যে বৈচিত্র্যময় রূপটি প্রকাশ পেয়েছে, তার ব্যাপারেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

১.১.৩ প্রথম ভাগ - বাংলা ভাষার জন্ম

সারা পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষাকে প্রথমে তাদের সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত বারোটি ভাষাবংশে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। যেমন – ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য, সেমীয়-হামীয়, বাণ্টু, ফিন্নো-উগ্রীয়, তুর্ক-মোঙ্গোল-মাঞ্চু, ককেশীয়, দ্রাবিড়, আস্ট্রিক, ভোট-চীনীয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয়, এস্‌কিমো, আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভাগ ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বা আর্য ভাষা। এই ভাষাবংশটি ভৌগোলিক বিস্তার ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে এগিয়ে ছিল। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশই হল বাংলা ভাষার আদি উৎস।

আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে এই ভাষার মানুষেরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং কালক্রমে এর থেকে জন্ম নেয় দশটি প্রাচীন ভাষা, যেমন – ইন্দো-ইরানীয়, বালতো-স্লাবিক, আল্‌বানীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক্‌, ইতালীক্‌, টিউটনিক্‌, কেলতিক্‌, তোখারীয়, হিট্টীয়। এর মধ্যে প্রথম ও প্রধান ভাষার নাম ছিল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ভাষাভাষী মানুষেরা নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিত। তারা একসময় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সময়টা ছিল মোটামুটিভাবে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। একটি শাখা ইরানে গিয়ে ইরানীয় আর্য ভাষার সূত্রপাত ঘটালো। অন্য ভাগটি ভারতীয় আর্য উপশাখা নাম নিয়ে ভারতে প্রবেশ করল ও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সূচনা করল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি রূপ ছিল – কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ। অঞ্চল বা প্রদেশের ওপর ভিত্তি করে মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ভাষার যুগে কথ্যরূপটির চারটি শাখার জন্ম হল – প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, দাক্ষিণাত্য। প্রাচ্য শাখা থেকে প্রাচ্যা ও প্রাচ্যমধ্যা উপশাখার জন্ম হল। সেই প্রাচ্যা ভাষা থেকে মাগধী প্রাকৃত ও পর্যায়ক্রমে সেখান থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মধ্যে দিয়ে

একসময় বাংলা ভাষার জন্ম হল। সময়টা ছিল আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই হল বাংলা ভাষার জন্মের ইতিবৃত্ত। এই একই সময়কালে বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, মারাঠী, সিন্ধী, পঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষারও জন্ম হয়। এদের একসাথে বলা হত নব্য ভারতীয় আর্যভাষা।

এখন ভাষা হল এক সজীব সত্তা। তার বদল অনিবার্য। বদল বা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই যে কোনো ভাষা সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলে। বাংলা ভাষার জন্মের পরে সময় থেকে সময়ান্তরে তার মধ্যে নানা বদল লক্ষ্য করা গেল। এই বদলের দিকে দৃষ্টি রেখে বাংলা ভাষার কয়েকটি ভাগ করা হল।

১.১.৪ সারাংশ

এই অংশে আমরা দেখলাম যে কিভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার মধ্যে দিয়ে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়কালে ভারতবর্ষে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম হল। এর পরে সেই ভাষার কথ্য রূপটির মধ্যে দিয়ে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা হয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলি আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম লাভ করল। পূর্ব ভারতে জন্ম নেওয়া এরকম এক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হল বাংলা। কিন্তু জন্ম নেওয়ার পরে সেই ভাষা ক্রমাগত রূপ বদলাতে থাকল। এবং এর ফলে বাংলা ভাষাকে কয়েকটি যুগে ভাগ করে নেওয়া হল, যার পরিচয় পরবর্তী অংশের আলোচনায় পাওয়া যাবে।

১.১.৫ দ্বিতীয় ভাগ – প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন বাংলা ভাষা –

এই যে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার জন্ম হল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, এই ভাষার নাম দেওয়া হল বাংলা ভাষা। এই বাংলা ভাষাকে নির্দিষ্ট কিছু ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণের বিচারে কয়েকটি কালপর্ব বা যুগে বিভাজন করে নেওয়া হল। এর মধ্যে সবচেয়ে আদি পর্ব হল প্রাচীন বাংলা ভাষা। মনে করা হয় এই ভাষার যে যুগ, তার সময়সীমা ছিল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ। তবে সঠিক বিচারে এর বিস্তার কেবলমাত্র ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দই ছিল। কারণ এই সময় পর্যন্তই প্রাচীন বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কালপর্বের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থের পরিচয় না পাওয়া যাওয়ার ফলে, এই সময়কালকে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ‘অন্ধকার যুগ’ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

প্রাচীন বাংলা ভাষা পর্বের বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত 'চর্যাপদ'। 'অমরকোষের টীকা' ও 'সেকশুভোদয়া'-কেও এই যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

এই যুগের বাংলা ভাষার বেশ কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথমে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

১) প্রাচীন বাংলা ভাষায় সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন লোপ পেত এবং সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হত। যেমন – 'পব্বত' থেকে হল 'পবত' এবং তার পরবর্তী রূপ হল 'পাবত'।

২) এই যুগের বাংলা ভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জন অনেক সময় লোপ পেত এবং তার প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে যেত। যেমন, 'শব্দেন' হল 'সাদেঁ'।

৩) পদের অন্তে একাধিক একক স্বরধ্বনি থাকলে, ক্রমশ দুটি মিলে একটি একক স্বরে পরিণত হত। যেমন, 'পুস্তিকা' থেকে রূপান্তরের পথ ধরে 'পোত্থিআ' থেকে 'পোথী' হল।

৪) দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে, উচ্চারণের দ্রুততায় প্রায়ই এই যুগের বাংলা ভাষায় তাদের মাঝে 'য়' ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে বসত। যেমন, নিকটে-নিঅড্ডী-নিয়ড্ডী-নিয়ডি – এখানে 'য়'' শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে বসে গেছে।

৫) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই হ'-কারে পরিণত হত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'মহাসুখ' পরিণত হল 'মহাসুহ'-তে।

৬) 'শ'-এর স্থানে 'স'-এর ব্যবহার প্রায়শই দেখা যেত। যেমন, পাটের আস ('আশা')।

প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল এরকম –

১) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি ছিল প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

যেমন – 'চঞ্চল চীএ পইঠো **কাল**' – এখানে কর্তৃকারকের শূন্য বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়।

২) এই সময় থেকে গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকের রূপ একরকম হতে থাকে এবং গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকে ক/কে/রে বিভক্তি বা শূন্য বিভক্তি পাওয়া যায়। মুখ্যকর্মে শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ ঘটত।

৩) এই যুগে করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল – এঁ। যেমন, 'মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা' – এই বাক্যে করণ কারকে 'এঁ' বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়। করণ কারক ও অধিকরণ কারক প্রায় একরকম হয়ে যাওয়ায়, অধিকরণ কারকের ক্ষেত্রেও এই একই বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে এছাড়াও অধিকরণের কিছু

নিজস্ব বিভক্তি ছিল – ই, এ, হি, তেঁ, ত। অধিকরণের বিভক্তিগুলির মধ্যে ‘এ’ বিভক্তির বাড়াবাড়ি রকম প্রয়োগ দেখা যেত। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই বাক্যটি – **‘জামে** কাম কি **কামে** জাম’, এখানে অধিকরণ কারকে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ হচ্ছে।

৪) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল এর, র, ক। যথা, **‘রুখের** তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ’।

৫) তির্যক বিভক্তি ছাড়াও অপাদান কারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল হুঁ। যথা – ‘রঅণহুঁ’ (রত্নাৎ)

৬) প্রাচীন বাংলা ভাষার সময়কালেই প্রথম অনুসর্গের ব্যবহার শুরু হয়। যেমন, ‘তোহোর **অন্তরে** মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী’ – এখানে ‘অন্তরে’ অনুসর্গের ব্যবহার হয়েছে।

৭) ক্রিয়ারূপে বর্তমান কালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে মি, হুঁ, মধ্যম পুরুষে –স এবং প্রথম পুরুষে –ই। অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন হত নিষ্ঠান্ত পদ দিয়ে এবং ধাতুর সঙ্গে –ল বা –ইল প্রত্যয় যুক্ত করে। এবং ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত –ইব যোগ করে।

ছন্দ-

প্রাচীন বাংলা ভাষার ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে এসময় মূলত পাদাকুলক ছন্দেই কবিতা লেখা হত।

১.১.৬ সারাংশ

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হল ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এরপর সেই বাংলা ভাষায় প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ধরে মানুষ রচনা করল সাহিত্যও। এই ভাষার নামকরণ পন্ডিতরা করেন প্রাচীন বাংলা ভাষা। সেই সময়ে রচিত সাহিত্যের প্রামাণ্য নিদর্শন মেলে চর্যাপদ গ্রন্থে। এটি ছিল সেই সময়কালে রচিত সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে। ১৯১৬ সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশরূপ লাভ করল। এখন এই চর্যাপদ যেহেতু প্রাচীন বাংলা ভাষায় লে

খা একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন, সুতরাং এর ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব হয়ে দাঁড়ায় অপরিসীম। এই গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই প্রধানত প্রাচীন বাংলার বেশ কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়। যেমন, যুগ্মব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লোপ পেলে, তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তার আগের স্বরধ্বনিটি দীর্ঘ উচ্চারিত হত এবং নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পেলে তার আগে থাকা স্বরধ্বনিটি ‘নাকি’ উচ্চারিত হত। ‘শ’-এর স্থানে ‘স’-এর ব্যবহার হত। দুই স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলে ‘য়’ ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি হিসাবে এসে বসে যেত। একক মহাপ্রাণ ধ্বনি পরিণত হত ‘হ’ কারে। কর্তৃকারক ও মুখ্যকর্মে শূন্য বিভক্তি এবং গৌণকর্মে ও সম্প্রদান কারকে ক/কে/রে বিভক্তি বা শূন্য

বিভক্তির প্রয়োগ ঘটত। করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল এঁ। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল এর, র, ক। এই যুগে প্রধানত পাদাকুলক ছন্দেই কবিতা লেখা হত।

১.১.৭ তৃতীয় ভাগ – মধ্য বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য

মধ্য বাংলা ভাষা –

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার পরে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আবির্ভাব হল। এর সময়সীমা ছিল মোটামুটি ভাবে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল। অর্থাৎ প্রায় ৪০০ বছর। এই ব্যাপ্ত সময়কালকে, ভাষার পরিবর্তনের চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগ ও অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যুগ।

আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগের সময়সীমা ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে নাম করা যায় বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য'-এর। এই সময়কার ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে এভাবে নির্দেশায়িত করা যায় –

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

১) আদিমধ্য বাংলা ভাষার প্রথম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ, অথবা পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনি মিলিত হয়ে যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হওয়া।

২) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবনে নাসিক্য ব্যঞ্জনের সংযোগও এই যুগের অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল বলে মনে করা হয়। যেমন – 'কান্তি' থেকে 'কাঁতি'।

৩) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। যেমন – 'হ্ন' থেকে 'ন'।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

১) এই যুগের ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি দেখা যেত। নিচের বাক্যটি হল এর উদাহরণ – 'শীতল মনোহর **বাঁশি** কে না বাএ'।

২) আদিমধ্যযুগে মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি যুক্ত হত না। গৌণকর্মে ও সম্প্রদান কারকে ক, কে, রে বিভক্তি যুক্ত হত।

৩) অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশের জন্য পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্য নেওয়া হত। যথা, 'আজি **হৈতেঁ** আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'।

৪) সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্য ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল এর, র, ক, কের। যেমন, 'চাহা চাহা আল বড়ায়ি **যমুনাক** ভিতে'।

৫) অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন ছিল ত, তে, এ। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল এই বাক্যটি – 'মদনবাণে **পরাণে** আকুলী ল'।

৬) উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল আহ্মে-মোঁ। মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ-তোহ্মে। এগুলির সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তি যুক্ত হওয়ার রেওয়াজ ছিল।

৭) আদি মধ্য যুগের বাংলা ভাষায় সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তি যুক্ত হত। এর উদাহরণ হল এই বাক্যটি - 'আজি হৈতেঁ **আহ্মারা** হৈলাহোঁ একমতী'।

৮) সেই যুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে ই, ইয়াঁ, ক, ইতেঁ, ইলে যুক্ত করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপগঠনের রেওয়াজ ছিল।

যেমন – 'পাখি নহোঁ তার ঠাই **উড়ি** পড়ি জাঁও।/ মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ'।

ছন্দ –

আদিমধ্য যুগের ছন্দের ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমে চলে যেতে হবে প্রাচীন যুগে বা তারও আগে। অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দ পাদাকুলকের প্রতি পদে ষোলোটি করে মাত্রা থাকত। তার থেকে পরবর্তীতে চতুষ্পদী ছন্দের জন্ম হয়। পাদাকুলকের একমাত্রা ক্ষয় পেয়ে চতুষ্পদীর প্রতি পদে পনেরো মাত্রা হয়ে যায়। চর্যাপদের সময়ে এই পাদাকুলক চতুষ্পদী থেকে বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হল। আদিমধ্য বাংলা ভাষার ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে এসময় পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এছাড়াও নানা ধরনের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহারও এ যুগের সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়।

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যুগের সময়সীমা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে নাম করা যায় বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, চৈতন্য জীবনীসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল), অনুবাদ সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভগবতের বাংলা অনুবাদ), আরাকান রাজসভার সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি সাহিত্যের। অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষা ছিল অনেক সমৃদ্ধ। এইসময় সাহিত্যের নানা শাখার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের বাংলা ভাষায় লেখা একাধিক সাহিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, যার থেকে সে যুগের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের কাজটি সম্ভবপর হয়েছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

১) এই যুগের বাংলা ভাষায় কোনো পদের অন্তে একক ব্যঞ্জন অবস্থান করলে, তার পরে থাকা 'অ'-কার লোপ পেত। অথচ পদের অন্তে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে, তার পরের 'অ'-কার বিলুপ্ত হত না। আবার পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে, 'অ'-কার ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি থাকলে, সেগুলি রক্ষা পেত।

২) পদের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে অনেক সময় শব্দের মধ্যে থাকা স্বরধ্বনির লোপের প্রবণতা এই যুগের বাংলা ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন, 'হরিদ্রা' হয়ে যেত 'হল্‌দি'। তবে এই বৈশিষ্ট্যটি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় তেমন ব্যাপক ভাবে দেখা যেত না।

৩) অপিনিহিতি হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে শব্দমধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' সেটি যে ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে আছে, তার আগে সরে এসে উচ্চারণ হয়। আর বিপর্যাস প্রক্রিয়ায় উচ্চারণের দ্রুততায় শব্দমধ্যস্থ দুটি ধ্বনি পরস্পরের মধ্যে স্থান বদল করে নেয়। এখন অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় অপিনিহিতি বা বিপর্যাস প্রক্রিয়ায় শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসত (যেমন – 'বেগুন' থেকে হল 'বেউগণ' ও তার থেকে 'বাইগণ')। আবার কখনো বিপর্যাস বা অপিনিহিতি প্রক্রিয়ায় আগে সরে আসা 'ই' বা 'উ' লোপও পেত। তবে এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক প্রয়োগ সর্বত্র পরিলক্ষিত হত এমন নয়।

৪) আদিমধ্য যুগের বাংলাতেই মহাপ্রাণ নাসিক্য অল্পপ্রাণ হতে আরম্ভ করেছিল। যেমন – 'আহ্মি' থেকে 'আমি' বা 'তোহ্মার' থেকে 'তোমার'। অন্ত্যমধ্য যুগে এই প্রবণতা আরো বেশি করে লক্ষ্য করা যেতে লাগল।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

১) আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় যেখানে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তির প্রয়োগের সূচনা হয়েছিল, অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলায় সেখানে বিশেষ্য পদের কর্তৃকারকের বহুবচনেও এই 'রা' বিভক্তির প্রয়োগ করা হত। এছাড়া নির্দেশক ও অনির্দেশক বহুবচনে 'গুলা', 'গুলি' বিভক্তির প্রয়োগও হত। এর একটি আদর্শ উদাহরণ নিচে দেওয়া হল –

'কে বলে শারদ শশী ও মুখের তুলা।/ পদনখে পড়ে আছে তার **কতগুলা**।।'

২) সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল 'র', 'এর'। এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাবে নিচের বাক্যটিতে –

'**রূপের** পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।/ **যৌবনের** বনে মন হারাইয়া গেল।।'

৩) সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন ছিল 'য়', 'এ', 'তে'। নিচের বাক্যটিতে এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় –

'উই চারা খাই **বনে** জাতিতে ভালুক।/ নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।'

৪) অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার বিভক্তি নিয়েও প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সাধারণ সদ্য অতীত কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি ছিল ইল, ইলা এবং উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি ছিল ইলাঙ, ইলাম।

তাছাড়া সাধারণ ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল – ইব। এর উদাহরণ হল এই বাক্যটি – 'সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।/ তোমার বদলে আমি **করিব** পসার।।'

৫) কিছু সংস্কৃত নামশব্দকে ক্রিয়ার ধাতুরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নামধাতুর উদ্ভব হয়। অন্ত্যমধ্য যুগের সাহিত্যে নামধাতুর এই ব্যবহার বহু স্থানে দেখা যেত। এটা ছিল সে যুগের এক অন্যতম ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

৬) মধ্যযুগে বাংলার শব্দভান্ডারে বহু আরবী-ফারসী, তুর্কী শব্দ ও প্রত্যয় গ্রহণ করা হয়েছিল। তৎকালীন মুসলমান শাসকদের প্রভাবেই এইসব শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারের অন্তর্ভূক্ত হয়।

ছন্দ-

অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পয়ার ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাছাড়াও বিভিন্ন ছাঁদের ত্রিপদী ছন্দও সাহিত্যে প্রযুক্ত হত। ব্রজবুলি ভাষায় লেখা বৈষ্ণব কবিতার প্রধান ছন্দ ছিল অপভ্রংশের চতুষ্পদী ছন্দ।

এই যুগের বাংলার একটি বিশেষ গুণ হল এই যে এসময় বাঙালি কবিরা বৈষ্ণব পদ রচনাকালে ব্রজবুলি ভাষা সৃষ্টি করে তার সাহায্যে সাহিত্য রচনা করত। এই ব্রজবুলি ভাষা হল মৈথিলী, অবহট্‌ঠ এবং বাংলা মিশ্রিত এক সাহিত্যিক ভাষা। তো সেই ব্রজবুলি ভাষাতে সাহিত্য রচনা এই অন্ত্যমধ্য যুগের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

১.১.৮ সারাংশ

মধ্যযুগের বাংলা ভাষাকে সময়পর্বের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আদিমধ্য বাংলা ভাষা ও অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষা। এই দুই যুগের বাংলা ভাষার মধ্যে ভাষাতত্ত্বের বিচারে ফারাক তৈরি হয়েছে। সেদিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

আদিমধ্যযুগের বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থই হল একমাত্র প্রামাণ্য নিদর্শন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে লেখা আর অন্য কোনো গ্রন্থের সন্ধান মেলেনি যেহেতু, তাই এই গ্রন্থের ভিত্তিতেই এই সময়ের বাংলা ভাষাকে চিনে নিতে হবে। এখন আদিমধ্য বাংলা ভাষায় পাশাপাশি দুটি ধ্বনি থাকলে দ্বিতীয়টির উচ্চারণ ক্ষীণ হত বা দুটি ধ্বনি মিলে যৌগিক স্বর হয়ে যেত। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন ও মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপও ছিল এ যুগের অন্যতম দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। এই যুগের বাংলা ভাষায় কর্তৃকারক ও মুখ্য কর্মে বিভক্তিহীনতা এবং গৌণকর্মে ও সম্প্রদান কারকে ক, কে, রে বিভক্তি যোগ হতে দেখা যেত। অপাদান কারকের অর্থপ্রকাশে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার হত। ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল এর, র, ক, কের। উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল আহ্মে-মোঁ। মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ-তোহ্মে। আদিমধ্য বাংলা ভাষার ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে এসময় পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এছাড়াও নানা রকম ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছিল।

অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে আরো বেশ কিছু বদল চোখে পড়ে যায়। এইসময় পদের অন্ত্যে একক ব্যঞ্জনের পরে থাকা 'অ'-কার লোপ পেত। অথচ যুক্তব্যঞ্জনের পরে থাকা 'অ'-কার অক্ষুণ্ণ থাকত। শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বরলোপের ঘটনা ঘটত। মহাপ্রাণ নাসিক্যের অল্পপ্রাণতা ও অপিনিহিতি প্রক্রিয়ায় শব্দের মধ্যে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটাও অন্ত্যমধ্য বাংলার অন্যতম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বনাম ও বিশেষ্যপদের কর্তৃকারকের বহুবচনে 'রা' বিভক্তির প্রয়োগ এবং নির্দেশক ও অনির্দেশক বহুবচনে 'গুলা', 'গুলি' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যেতে লাগল। অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন র, এর এবং সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন য়, এ, তে ছিল। এই সময়কালে নামধাতুর উদ্ভব হয় এবং বাংলার শব্দভান্ডারে বহু আরবী-ফারসী, তুর্কী শব্দ ও প্রত্যয় গৃহীত হয়ে বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ছন্দে কবিতা লেখার পাশাপাশি ব্রজবুলি ভাষার জন্মও এই যুগের অন্যতম বিশেষ দিক।

১.১.৯ চতুর্থ ভাগ – আধুনিক বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ও উপভাষা

আধুনিক বাংলা ভাষা

মধ্য যুগের বাংলা ভাষার পরে বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের আবির্ভাব হল। এর সময়সীমা হল মোটামুটি ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল। ১৭৬০ সালে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর ঘটনাকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা ধরে নিয়েছেন। সুতরাং এরপর থেকে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য কিছু নতুন লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হল, এ কথা ধরে নেওয়া যেতেই পারে।

এখন দেখে নেওয়া যাক আধুনিক বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল কি কি এবং কোথায়, কিভাবে তারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য –

১) মধ্যযুগ থেকেই মানুষের মুখের ভাষা ছিল পদ্যভাষা। কিন্তু আধুনিক যুগে প্রথম পদ্যভাষার সাথে গদ্যভাষাতেও সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল।

২) সাহিত্যে যে গদ্য ভাষার ব্যবহার শুরু হল, তার আবার দুটি শাখার জন্ম হল, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। মধ্যযুগের বাংলার ধাঁচে যে সাহিত্য লেখা হত, তাকে সাধুভাষার পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার সন্নিকটস্থ অঞ্চলের লৌকিক কথ্য ভাষাই সাহিত্যে চলিত ভাষা রূপে পরিগণিত হল। এই দুই গদ্য, সাধু ও চলিত প্রায় সমসময়ে শুরু হলেও, ঊনবিংশ শতকের গদ্যে যেমন সাধুভাষার প্রয়োগ অধিক লক্ষ্য

করা যেত, তার পরবর্তীতে আবার চলিত ভাষার প্রয়োগ অধিক হয়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যে প্রধানত চলিত গদ্যই বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৩) আধুনিক যুগের বাংলা ভাষায় সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে - সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গের দীর্ঘরূপ বজায় থাকত, যেমন – করিয়া, বলিয়া, আমাদিগের, সহিত ইত্যাদি। চলিত ভাষার ক্ষেত্রে এর সংক্ষিপ্ততম রূপটির প্রকাশ লক্ষ্য করা যেত, যেমন – করে, বলে, যার, তার, সঙ্গে ইত্যাদি।

৪) মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল অপিনিহিতি বা বিপর্যাস প্রক্রিয়ায় শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসত। আধুনিক বাংলা ভাষায় এর পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অভিশ্রুতি সংঘটিত হত, যার ফলে অপিনিহিত 'ই' বা 'উ' পার্শ্ববর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যেত।

৫) শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি থাকা দুটি পৃথক্ স্বরধ্বনি একটি অন্যটিকে বা দুটি পরস্পরকে প্রভাবিত করে একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই প্রক্রিয়াকে বলে স্বরসঙ্গতি।

এখন আধুনিক চলিত বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে কাছাকাছি বা পাশাপাশি থাকা দুটি বিষম স্বরধ্বনির একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হওয়ার এই স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়াটি প্রায়শই দেখা যেতে লাগল।

৬) ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার এই যুগের বাংলা ভাষায় শুরু হল। তবে প্রথমদিকে এর ব্যবহার সাধুভাষায় বেশি দেখা যেত। যেমন – গমন করা, চয়ন করা। পরবর্তীতে চলিত বাংলা ভাষায়ও এই যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার হতে শুরু করল। যেমন – গান করা, দান করা। আবার আরো পরের দিকে সাধুভাষার সরলীকরণের কারণে এই যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমতে থাকল।

৭) আধুনিক বাংলা ভাষায় দুটি সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার অধিক দেখা যায়, যেগুলি হল – 'ও', 'এবং'। এর মধ্যে 'এবং'-এর ব্যবহার পূর্ববর্তী কাল থেকেই চলে আসছিল। 'ও' হল আধুনিক বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। দুটি পদকে যুক্ত করতে সাধারণত এই 'ও'-এর ব্যবহার করা হত।

৮) আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার বাক্য-গঠনরীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নঞর্থক অব্যয়, যথা – 'নি', 'না', 'নাই' ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে (যথা- 'সে লেখাপড়া না করে খেলতে যযায় না') ও সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসত (যথা- 'সে কথনো বাবার কথার অন্যথা করেনি')। তবে কখনো কখনো এও দেখা যায় যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগেও বসে থাকত। যেমন- 'রমা না বাজারে গেল, না মেলায় গেল, সারাদিন চুপ করে ঘরে বসে রইল'।

৯) যৌগিক বাক্য হল এমন বাক্য যেখানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা একাধিক সরল বাক্যকে সংযুক্ত করা হয়। একটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ হল এটি – 'সে বাড়ি ফিরল ও খেতে বসল'। আধুনিক বাংলা ভাষার অন্যতম

বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার না করেই পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করেও দুটি বাক্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে একটি সরল বাক্য রচনা করা হত। এখন উপরোক্ত বাক্যটি আধুনিক ভাষায় এই রূপ নিল – 'সে বাড়ি ফিরে খেতে বসল'।

১০) আধুনিক যুগের বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব গভীরতম। তার ফলে বাংলা ভাষায় বহু ইংরাজী শব্দ ঢুকে পড়েছে। যেমন – রেডিও, টেবিল, চেয়ার। শুধু ইংরাজী ভাষা নয়, পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান ভাষা থেকেও বহু শব্দের আমদানী বাংলা ভাষায় হতে থাকে। এর ফলে বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়।

বাংলা ভাষার বিবর্তনের স্তরপর্যায় লক্ষ্য করলে আমরা দেখব, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যখন আধুনিক বাংলা ভাষার সূত্রপাত, তার পরেও বিভিন্ন কারণে সেই ভাষাশরীরে কম-বেশী বদল এসেছে। উদ্ভব ঘটেছে নতুন স্তরের। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় উপভাষার কথা। আদর্শ বাংলা ভাষার ব্যবহার অঞ্চল বিশেষে মানুষ নিজের মতো করে করতে থাকলে, সেখান থেকেই জন্ম হয় উপভাষার। এই উপভাষার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য অবশ্য মুখের ভাষার মধ্যেই ধরা পড়ত। কর্মক্ষেত্রে আদর্শ ভাষার ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গেলে বলা যায়, একই ভাষার মধ্যে যে আঞ্চলিক পার্থক্য, একেই আঞ্চলিক উপভাষা বলা হয়।

বাংলা ভাষার প্রধান উপভাষার সংখ্যা ছিল পাঁচটি। রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খন্ডী, কামরূপী বা রাজবংশী। পৃথক অঞ্চলভেদে এগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা যেত। যেমন, রাঢী বাংলা ভাষার ব্যবহার ছিল বীরভূম, বর্ধমান, কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে। বঙ্গালী উপভাষার ব্যবহার ছিল ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে। বরেন্দ্রী ভাষার প্রয়োগ ঘটত উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে। ঝাড়খন্ডী ভাষায় কথা বলত মানভূম, সিংভূম, ধলভূম প্রভৃতি স্থানের মানুষ। রাজবংশী ভাষা প্রচলিত ছিল জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে। আধুনিক বাংলা ভাষার অন্তর্গত এই পাঁচটি উপভাষার ছিল এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ, যা ছিল এক একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত এবং এই উপভাষাগুলির সাথে আদর্শ বাংলা ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য সৃষ্টি হত। শুধু অঞ্চলভেদেই নয়, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপর ভিত্তি করেও বাংলা ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা যায়। একে 'সামাজিক উপভাষা' শিরোনামে নামাঙ্কিত করা যায়।

তবে শুধু উপভাষাই বাংলা ভাষার বিবর্তনের অন্তিম স্তর নয়। উপভাষার পরে সৃষ্টি হল বিভাষার। এক একটি উপভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য অনুযায়ী যে স্বতন্ত্র রূপের গঠন হয়, তাকেই বিভাষা বলে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার বিস্তার যেহেতু বেশি, তাই মধ্যেও একাধিক বিভাষার জন্ম হয়েছে। শুধুমাত্র রাঢ়ী ভাষারই চারটি উপবিভাগ আছে, ক) পূর্ব-মধ্য খ) পশ্চিম মধ্য গ) উত্তর-মধ্য ঘ) দক্ষিণ-মধ্য। এভাবেই সব উপভাষার মধ্যে কিছু শ্রেণি গড়ে উঠেছে তাদের স্থানিক ভাষাগত বৈচিত্রের ওপর ভিত্তি করে।

সবশেষে বলা যায় যে এভাবেই একই ভাষার মধ্যে নানা স্তর ও পর্যায়ে পার্থক্য থাকে। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপ ক্রমশ জটিল ও বিচিত্র হতে থাকে। এভাবেই কোনো ভাষা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় ও সমৃদ্ধ হতে থাকে।

১.১.১০ সারাংশ

১৭৬০ সালে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর ঘটনাকে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার সূচনা বলে বাংলা সাহিত্যিক এবং ভাষাবিদ্‌রা ধরে নিয়েছেন। সুতরাং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরের সময়ের ভাষাকে আধুনিক বাংলা ভাষা বলা হয়। এই ভাষার নিজস্ব কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলি একে মধ্যযুগের বাংলা থেকে আলাদা করে দেয়। সেগুলি হল এরকম – আধুনিক যুগে পদ্যভাষার পাশাপাশি গদ্যভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল। সাহিত্যে সাধুভাষার পাশাপাশি মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষার প্রচলন দেখা দিতে লাগল। সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গের দীর্ঘরূপ ও চলিত ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত রূপটি গৃহীত হল। ধ্বনি পরিবর্তনের দুটি প্রক্রিয়া অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি এই আধুনিক যুগের ভাষাতেই লক্ষিত হতে থাকল। যৌগিক ক্রিয়া ও 'ও' – এই সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার বাংলা ভাষায় দেখা দিল। বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান ভাষা থেকে আগত নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার হতে থাকল, যার ফলে বাংলা শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হল। তাছাড়াও এই যুগের বাংলা ভাষায় অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য দেখা দিতে থাকায় উপভাষাগুলির জন্ম হল। সংক্ষেপে এটাই হল আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য।

১.১.১১ নির্বাচিত পুস্তক তালিকা

রামেশ্বর শ – সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

অনুশীলনী – ১

১) নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক্() চিহ্ন দিন। উত্তর করা হয়ে গেলে নিচে দেওয়া উত্তর সংকেত দেখে মিলিয়ে নিন।

ক) সারা পৃথিবীর ভাষাগুলিকে মোট কয়টি ভাষা বংশে ভাগ করে নেওয়া হয় –

১) ১২টি

২) ১৫টি

৩) ৯টি

খ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি রূপ ছিল –

১) আদি ও সমাপ্ত রূপ

২) ভারতীয় ও বহির্দেশীয় রূপ

৩) কথ্যরূপ ও সাহিত্যিক রূপ

গ) প্রাচীন বাংলায় সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন লোপ পেলে –

১) সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হত

২) সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হত

৩) সেই লোপের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দীর্ঘ উচ্চারিত হত।

ঘ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকের বিভক্তি ছিল –

১) শূন্য বিভক্তি

২) ক, কে, রে বিভক্তি

৩) এঁ বিভক্তি

ঙ) আদিমধ্য বাংলা ভাষার যুগের সময়সীমা ছিল -

১) ১২০০-১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ

২) ১৭৬০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ

৩) ১৩৫০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ

চ) অপিনিহিতি ও বিপর্যাস প্রক্রিয়া কোন যুগের বাংলা ভাষায় বেশি দেখতে পাওয়া যায় –

১) প্রাচীন যুগ

২) আদিমধ্য যুগ

৩) অন্ত্যমধ্য যুগ

ছ) মধ্যযুগে বাংলার শব্দভান্ডারে বহু আরবী-ফারসী, তুর্কী শব্দ ও প্রত্যয় গ্রহণ করা হয়েছিল

১) ইরানীয় আর্যভাষার প্রভাবে

২) সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে

৩) তৎকালীন সুলতানী শাসকদের প্রভাবে

জ) আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় নির্দেশক ও অনির্দেশক বহুবচনে কোন বিভক্তিগুলির প্রয়োগ ঘটত –

১) ক, কে, রে বিভক্তি

২) ‘গুলা’, ‘গুলি’ বিভক্তি

৩) শূন্যবিভক্তি

ঝ) ব্রজবুলি ভাষা হল

১) একটি হিন্দী ভাষা

২) মৈথিলী, অবহট্‌ঠ এবং বাংলা মিশ্রিত এক সাহিত্যিক ভাষা

৩) একটি বহির্দেশীয় ভাষা

ঞ) আধুনিক বাংলা ভাষায় দুটি সংযোজক অব্যয় হল –

১) ‘ও’, ‘এবং’

২) যথা ও তথা

৩) কিন্তু, কেন

২) নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

ক) মধ্যযুগীয় ভারতীয় আর্য ভাষার যুগে কথ্যরূপটির ------ শাখা ছিল।

খ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে বাংলা ছাড়াও ------, -------- প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়।

গ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় তির্যক বিভক্তি ছাড়াও অপাদান কারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল -----।

ঘ) আদিমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে -ই, -ইয়াঁ, -ক, -ইতেঁ, -ইলে যুক্ত করে ---------- রূপগঠনের রেওয়াজ ছিল।

ঙ) -------- যুগের সাহিত্যে নামধাতুর ব্যবহার বহু স্থানে দেখা যেত।

চ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় মূলত ------ ছন্দেই কবিতা লেখা হত।

ছ) আদিমধ্য বাংলায় অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশের জন্য ---------- ক্ষেত্রে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্য নেওয়া হত।

জ) ১৭৬০ সালে মধ্যযুগে ------- মৃত্যুর ঘটনাকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলে ধরে নেওয়া হয়।

ঝ) গদ্য ভাষার দুটি শাখা হল ------- ও চলিত ভাষা।

ঞ) --------- উপভাষার ব্যবহার ছিল ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে।

৩) নিচের লেখা উত্তরগুলি পাঠ করে কোনটি শুদ্ধ ও কোনটি অশুদ্ধ তা নির্দিষ্ট শূন্যস্থানে লিখুন।

ক) ইন্দো ইউরোপীয় আর্য ভাষা আসলে বাংলা ভাষার জননী। -------

খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে পরবর্তীকালে চারটি প্রাচীন ভাষা জন্ম নিয়েছিল। ---------

গ) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ ছিল আধুনিক বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। -------

ঘ) বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে প্রথম পদ্যভাষার সাথে গদ্যভাষাতেও সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল। -------

ঙ) রাঢী বাংলা ভাষার ব্যবহার ছিল উত্তরবঙ্গের মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে। -------

চ) অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদ রচিত হত। --------

ছ) প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্থানে 'য়' ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে বসে যেত। ----------

১.১.১২ উত্তর সংকেত

১) ক) ১

খ) ৩

গ) ২

ঘ) ১

ঙ) ৩

চ) ৩

ছ) ৩

জ) ২

ঝ) ২

ঞ) ১

২)

ক) চারটি

খ) কাশ্মীরী/সিন্ধী/পঞ্জাবী/মারাঠী/গুজরাটী/অসমীয়া/মণিপুরী/রাজস্থানী/ওড়িয়া ইত্যাদি

যে কোনো দুটি ভারতীয় ভাষা

গ) -হুঁ

ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়ার

ঙ) অন্ত্যমধ্য

চ) পাদাকুলক ছ) পঞ্চমী বিভক্তির জ) কবি ভারতচন্দ্রের ঝ) সাধু ভাষা ঞ) বঙ্গালী

৩) ক) শুদ্ধ খ) অশুদ্ধ গ) অশুদ্ধ ঘ) শুদ্ধ ঙ) অশুদ্ধ চ) শুদ্ধ ছ) শুদ্ধ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY